১৮৫৭-এর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা (পর্ব-১)

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামের আহবান প্রথম দিক থেকেই মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে। কেন? কারণ ইসলাম মানুষকে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছে। একটি উন্নত জীবন, শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা, সামাজিক সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, খাদ্য আহরণ, উৎপাদন ও বিপণনে কারো অধিকার ক্ষুণ্ন না করে পুরোপুরি ন্যায় ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠা এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন অবসানের গ্যারান্টি দিয়েছে। মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ উপমহাদেশীয় পরিমণ্ডলে এর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় উলামার গুরুত্ব এমনিতে প্রতিটি নবুওয়াতী ধর্মে একদল জ্ঞানী ও পণ্ডিতের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেখানে তাঁরা বিশেষ মর্যাদায় আসীন। ধর্মের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রায় তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে তাঁদের বিশেষ শ্রেণীও গড়ে উঠেছে। যেমন ইহুদী ধর্মে রাব্বি, ফরিশী, ঈসায়ী ধর্মে পোপ, যাজক, পাদ্রী ইত্যাদি। তারা ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক পর্যায়েও নিজেদেরকে উচ্চতায় উন্নীত করেন।

ইসলাম প্রথম দিন থেকেই এই জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কোনো বিশেষ শ্রেণী গঠন করার চেষ্টা করেনি, বরং ইসলামী জ্ঞানের সাথে সাথে জাগতিক জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয করে দিয়েছে। কারণ ইসলামের মূল গ্রন্থ কুরআন সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য এই উভয় প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন। ইসলামের পরিভাষায় এই জ্ঞানকে বলা হয় ইল্‌ম। যাঁরা এই ইল্‌মে পারদর্শিতা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন পরবর্তী কালে তাঁদেরকে আলেম নামে অভিহিত করা হয়েছে।

> মুসলিম সমাজে এক দেড়শো বছর আগে পর্যন্তও এই আলেমগণই ছিলেন মধ্যমণি। মুসলমানদেরকে তাঁরাই পরিচালিত করতেন। তাঁরাই ছিলেন মুসলিম সমাজের অবিসংবাদিত নেতা, বিশেষ করে উপমহাদেশের মুসলমানদের বিগত তেরশো বছরের ইতিহাসের (মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু অভিযান থেকে শুরু করে) এগারোশো সাড়ে এগারোশো বছর একথাই বলে। দেশ শাসন করেছেন রাজা-বাদশাহরা কিন্তু জনগনকে নেতৃত্ব দিয়েছেন উলামায় কেরাম, বরং দেশ পরিচালনায়ও উলামায়ে কেরামের বিশেষ অবদান স্বীকৃত হয়েছে। এঁরা ছিলেন জাগতিক ও ইসলামী উভয় জ্ঞানে সমান পারদর্শী। গোড়া থেকেই মুসলিম আমলের শিক্ষা সিলেবাস এ উভয় প্রকার জ্ঞানের সমন্বয়ে রচিত ও বিকশিত হয়েছিল। তাই আমরা দেখি হিজরী দ্বিতীয় শতকে ইমাম আবু হানীফা র. যে ফিক্‌হ পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন তার সদস্য ছিলেন একদিকে যেমন কুরআন বিশেষজ্ঞ ও হাদীস বিশেষজ্ঞ তেমনি অন্যদিকে ছিলেন সাহিত্যবিশারদ, অভিধান বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, কৃষি ও ব্যবসায় বিশেষজ্ঞগণ।

তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না, মুসলিম চিন্তা দর্শনে শাসক ও উলামা দু'টি পৃথক গোষ্ঠী নয়। যিনি শাসক তিনি আলেম এবং যিনি আলেম তিনি শাসক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা স্বতন্ত্র। তিনি আল্লাহর নবী। অহী ও তাঁরই ইল্‌মের সাহায্যে। তারপর দ্বিতীয় শাসক আবুবকরকে রা. দেখি তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ আলেম। হযরত উমরের রা. সময় দেখি তিনি তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ আলেম। এভাবে হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা. ও হযরত আমীর মুআবিয়ার রা. সময়ও আমরা এর ব্যতিক্রম দেখি না। এরপর থেকে রাজতান্ত্রিক আমলে শাসক ও আলেমের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এ বিচ্ছিন্নতা

পরবর্তী হাজার বারশো বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এর মাঝখানে মাত্র হাতে গোনা কয়েকবার এমন ঘটেছে যখন নিছক ঘটনাক্রমে উমর ইবনে আবদুল আযীয বা আওরংগজেব প্রমুখের মতো শাসক ও আলেম একীভূত হয়েছেন।

আঠারো-উনিশ শতকে শাহ অলিউল্লাহ থেকে শাহ ইসমাঈল আঠারো শতকের হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসনের পতনের শেষ পর্বে এসেও আমরা রাজদরবার থেকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের ব্যাপক প্রভাব প্রত্যক্ষ করি। মোগল বাদশাহ আওরংগজেবের পঞ্চাশ বছরের শাসন একদিকে যেমন মোগল সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করে কান্দাহার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত, দক্ষিন ও মধ্যভারতের বিশাল অংশও তার পদানত হয়, তেমনি অন্যদিকে এই প্রথমবার উপমহাদেশের বৃহত্তম অংশ একই পতাকাতলে একীভূত হয়ে একটি বৃহত্তর একক হিন্দুস্তানী রাজ্য গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই মহান বাদশাহও অসাধারণ প্রতিভার দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসানও ঘনিয়ে আসে। এ সময় মানবতা ও মিল্লাতের উদ্ধারকল্পে এগিয়ে আসেন শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (১৭০৭-১৭৬২ ঈ.)। তিনি মোগলদের নির্বীর্যতা, শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা ও শাসক সমাজের আযোগ্যতা এবং সর্বোপরি মুসলিম সমাজের সঠিক অধঃপতন পর্যালোচনা করে সমগ্র উপমহাদেশের জনবসতির জন্য একটি ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করেন। তিনি চিহ্নিত করেন, বর্তমানের সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধ্বংসকারিতার মূল কারণ হচ্ছে বর্তমান রাজতান্ত্রিক শাসন যে ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ঘুণে ধরে গেছে। তার মধ্যে সঠিক পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁর ভাষায় ফাক্কু কুল্লি নিযাম অর্থাৎ সমস্ত ব্যবস্থাটি ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

তিনি সাধারণ কর্মজীবী মানুষ, বিশেষ করে দেশের লাখো লাখো কারিগর, কৃষক, ভূমিশ্রমিকদের তাদের ন্যায্য অধিকার দেবার কথা বলেন। তাদেরকে দেশের উৎপাদন ও অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসেবে গণ্য করেন। যে ব্যবস্থা কৃষিজীবী ও মেহনত পেশাদের ওপর অত্যধিক ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেয়, তাকে দেশের ও জাতির শত্রু গণ্য করেন। তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, বুদূরুল বাযিগা ইত্যাদি গ্রন্থগুলোতে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে রুটি, কাপড়, বাসস্থান এবং বিয়ে করা ও নিজের সন্তান লালন-পালন করার মতো আর্থিক সামর্থ অর্জন করা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার গণ্য করেছেন। এভাবে সারা দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফ করার তাকিদ করেছেন।

> তিনি বলেছেন, জমিনের আসল মালিক আল্লাহ। দেশের অধিবাসীরা (আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে) কোনো মুসাফিরখানায় অবস্থানরত মুসাফিরের ন্যায়। মালিকানার অর্থ হচ্ছে, একজনের উপকৃত হবার অধিকারে অন্য কারোর হস্তক্ষেপ আইনগত নিষিদ্ধ। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, জীবিকা অন্বেষণ অধ্যায়) দেশের সমস্ত অধিবাসীর অধিকার সমান। কারোর অধিকার নেই নিজেকে দেশের মালিক, জনগণের গর্দানের মালিক বা জাতির মালিক ধারণা করার। কোনো ক্ষমতাসীনের জন্য এধরনের কোনো শব্দ ব্যবহার করারও কারোর ইখতিয়ার নেই। (মানসাবে ইমামত, ভ্রষ্ট শাসন প্রণালী প্রসংগ, শাহ ইসমাঈল শহীদ)।১

শাহ অলিউল্লাহ তাঁর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দিল্লী, লাক্ষ্ণৌ, বিজনৌর, রায় বেরিলী, নজিবাবাদ, সিন্ধুর আট্টা ইত্যাদি বিভিন্ন শহরে একাধিক ইলমী কেন্দ্র স্থাপন করেন। শাহ সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় নিজের বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চার সুযোগ্য সন্তান শাহ আবদুল আযীয, শাহ আবদুল গণী, শাহ আবদুল কাদের ও শাহ রফিউদ্দীন এ গুরুভার নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নেন। তাঁদের সাথে যোগ দেন হিন্দুস্তানের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ আলেম।

শাহ আবদুল আযীযের ফতোয়া তদানীন্তন হিন্দুস্তানকে শাহ আবদুল আযীয দারুল হারব ঘোষণা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি ফতোয়ায় বলেন: এদেশে ঈসায়ী শাসকদের হুকুম চলছে। তাদের হুকুম চলার অর্থ হচ্ছে, দেশ পরিচলনা, প্রজা পালন, আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা, জমির খাজনা, ট্যাক্স, বাণিজ্যিক শুল্ক, চোর-ডাকাত দমন, মামলা-মোকদ্দমার ফায়সালা, অপরাধীর শাস্তি ইত্যাদি (অর্থাৎ সামরিক, বেসামরিক, পুলিশ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল বিষয়ের কাস্টম ও ডিউটি ইত্যাদি) সকল বিষয়ের পূর্ণ কর্তৃত্বে তারাই সমাসীন। তাদের এসব কাজে হিন্দুস্তানীরা কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে জুমার নামায, দুই ঈদের নামায, আযান ও গরু যবেহ করার মতো মুসলমানদের কয়েকটি ধর্মীয় বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু এসবের মূল ও স্বাধীনতার ভিত্তি যে জিনিসটি (অর্থাৎ বিবেক ও মত প্রকাশের এবং নাগরিক জীবনের স্বাধীনতা) সেটাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়েছে। কাজেই নির্দ্বিধায় মসজিদ ভেঙে ফেলা হচ্ছে। জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা পদদলিত হচ্ছে, এমনকি কোনো মুসলমান বা হিন্দু পারমিট ও পাসপোর্ট ছাড়া এই শহর থেকে ওই শহরে এবং এর বাইরে ও আশেপাশে কোথাও যেতে পারে না। ব্যবসায়ীদের আসা-যাওয়ার যে পারমিশান আছে সেটাও নাগরিক স্বাধীনতার কারণে নয়, বরং ইংরেজ শাসকদের নিজেদের ব্যবসায়িক ও

লাভের স্বার্থে।...দিল্লী থেকে কোলকাতা পর্যন্ত তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। তবে হায়দারাবাদ, লাক্ষ্ণৌ, রামপুর ইত্যাদি ডানে-বাঁয়ে কয়েকটি এলাকায় সরাসরি ঈসায়ী শাসকদের হুকুম জারী নেই। কারণ সেখানকার মুসলিম শাসকরা ইংরেজের আনুগত্য মেনে নিয়ে তাদেরকে কর দিচ্ছে। কিন্তু এর ফলে সারা দেশের দারুল হরব হওয়ার ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।২

ফতোয়ায় দারুল-হারব-এ ধর্মীয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হলেও এখানে এর রাজনৈতিক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ ১. আইন প্রণয়নের সমস্ত অধিকার ইসায়ী শাসকদের হাতে রয়েছে। ২. ধর্মের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। ৩. ব্যক্তি ও নাগরিক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে।

কাজেই এই বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রত্যেক মুসলমান ও দেশপ্রেমিক নাগরিকের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তালীম ও তারবিয়তী কেন্দ্র স্থাপন এভাবে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্বের আঠারো-উনিশ শতকের হিন্দুস্তানী উলামায়ে কেরাম ইংরেজের শাসনদণ্ডের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নেন। শাহ অলিউল্লাহ থেকে এ প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়। শাহ আব্দুল আযীয (১৭৪৬-১৮২৪)-এর পূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। শাহ অলিউল্লাহ প্রতিষ্ঠিত দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত তালিম ও তরবিয়তী তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালি করেন এবং এগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবী ও জ্ঞানী আলেমগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করেন। শাহ অলিউল্লাহর সমসাময়িক আলেমগণের মধ্য থেকে যাঁরা এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে এর কেন্দ্রগুলো পরিচালনায় সহায়তা করছিলেন তাঁরা হচ্ছেন:

১. মুজফফরনগর জেলার পাহাল্‌ত কসবার মওলানা মুহাম্মদ আশেক। তিনি ছিলেন শাহ সাহেবের মামাত ভাই এবং একান্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। শাহ সাহেবের অনেক গ্রন্থ তাঁরই পরামর্শে রচিত।

২. মীরাট জেলার বুঢানার মওলানা নূরুল্লাহ। তিনি শাহ সাহেবের ঘনিষ্ঠ শিষ্য এবং তাঁর পরামর্শে শাহ সাহেব তাফহীমাতে ইলাহীয়া গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শাহ আবদুল আযীযের উস্তাদ ও শ্বশুরও ছিলেন। মওলানা নূরুল্লাহর পুত্র মওলানা হিবাতুল্লাহ ও নাতি মওলানা আবদুল হাই পরবর্তী পর্যায়ে এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

৩. মওলানা আবদুল আমীন কাশ্মিরী। শাহ সাহেবের অন্তরংগ সাথী। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি প্রশিক্ষন কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

৪. রায় বেরিলির হযরত শাহ আবু সাঈদ। তিনি ছিলেন রায় বেরিলির প্রখ্যাত ইলমী বুযর্গ হযরত শাহ ইলমুল্লাহর নাতি। পরবর্তী কালে আন্দোলনে নেতৃত্বাদানকারী হযরত সাঈয়েদ আহমদ শহীদ ছিলেন তাঁরই দৌহিত্র যিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন মুসলিম জনগণকে সংগঠিত করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫. মওলানা মাখদুম লাক্ষ্ণৌভী। তিনি ছিলেন হযরত শাহ অলিউল্লাহর বিশিষ্ট শাগরিদ। হযরত শাহ আবদুল আযীয ছিলেন এর প্রধান পরিচালক।

তালীম ও তারবিয়তী কেন্দ্রগুলোর পাঠক্রম এই কেন্দ্রগুলোতে যেসব বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হতো সেগুলো ছিল:

এক. শাহ অলিউল্লাহর মতাদর্শ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত ও সচেতন করে তোলা।

দুই. আল্লাহর আনুগত্য ও আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করা।

তিন. বাদশাহ প্রীতি ও রাজতান্ত্রিক ভাবধারা থেকে হৃদয়-মনকে বিমুক্ত করা।

চার. একটি উন্নত লক্ষ্য ও উদ্দেশে পৌঁছানোর জন্য জীবন উৎসর্গ করা।

পাঁচ. মানুষের সেবায় ও মানুষের প্রতি সহমর্মিতায়, বিশেষ করে নিজের ক্ষতি ও কষ্ট উপেক্ষা করে অন্যের উপকার সাধনে সচেষ্ট হওয়া।

ছয়. আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবন যাপনের পরিবর্তে সাদামাটা জীবন যাপন করা।

সাত. নিজের মধ্যে সৈনিকসুলভ তথা জিহাদী স্পিরিট সৃষ্টি করা। কৃচ্ছ্রসাধন, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সব রকমের পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়া।

আট. এমন ধরনের রীতিনীতি পরিহার করা যা সমাজকে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

নয়. ইন্দ্রিয় সেবার আড্ডা খতম করা এবং এমন সব অপকর্মের সংস্কার ও সংশোধন করা যেগুলো সমাজকে বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয় পূজায় লিপ্ত এবং মানুষকে আরামপ্রিয় ও হিম্মতহারা একটা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে। এই পাঠক্রমকে কার্যকর করার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি, বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ত্যাগ-তিতিক্ষা, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, আত্মসংযম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সত্যপ্রীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে জীবন উৎসর্গ করার মনোভাব সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

শাহ আবদুল আযীযের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি নিজের তিন সহোদর শাহ আবদুল গণী, শাহ আবদুল কাদের ও শাহ রফিউদ্দনিকে নিজের সবচেয়ে বড় সহযোগী হিসেবে গড়ে তোলেন। একই সংগে এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে এক দশকের মধ্যে সারা হিন্দুস্তানব্যাপী অসংখ্য শ্রেষ্ঠ, মেধাবী, জ্ঞানী, পরিশ্রমী, ত্যাগী, লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম তৈরি করেন। সমসাময়িক একজন আলেম বলেন, তিনি শাহ আবদুল আযীযের শাগরিদ নন এমন একজন হাদীসের উস্তাদের খোঁজে সারা হিন্দুস্তান চষে বেড়ান। কিন্তু এমন একজনকেও তিনি পাননি।৩

এঁদেরমধ্য থেকে নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন কয়েকজন আলেমের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক। তিনি শাহ আবদুল আযীযের দৌহিত্র শায়খ মুহাম্মদ আফজালের পুত্র। ২. মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব। ৩. মওলানা শাহ আবদুল হাই, শাহ আবদুল আযীযের জামাতা। ৪. মওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল, শাহ আবদুল গণীর পুত্র। ৫. মওলানা সাইয়েদ আহমদ শহীদ, রায় বেরিলী। ৬. মওলানা রশীদউদ্দীন দেহলবী। ৭. মওলানা মুফতী সদরুদ্দীন দেহলবী। ৮. মওলানা মুফতী ইলাহী বখ্‌শ, কান্ধলা। ৯. হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলবী। ১০. মওলানা মখসূসুল্লাহ, শাহ রফীউদ্দীনের পুত্র। ১১. মওলানা করীমুল্লাহ দেহলবী, মওলানা লুৎফুল্লাহ ফারুকীর পুত্র। ১২. মওলানা মীর মাহবুব আলী দেহলবী। ১৩. মওলানা আবদুল খালেক দেহলবী। ১৪. মওলানা হাসান আলী লাক্ষ্ণৌভী। ১৫. মওলানা হোসাইন আহমদ মালীহাবাদী।

সাইয়েদ আহমদকে নেতৃত্ব দান সারা দেশের ইসলামী তালীম ও তরবিয়তী কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে হযরত শাহ আবদুল আযীয একটি সুসংগঠিত দল গড়ে তোলেন। এ দলের নেতৃত্ব তুলে দেন তাঁর সরাসরি শাগরিদ রায় বেরিলীর সাইয়েদ আহমদ শহীদের হাতে। হযরত সাইয়েদ আহমদ উচ্চ সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু এত বড় একটা ইসলামী দলে নেতৃত্ব দেবার জন্য তাঁর মধ্যে যে ইলমি কমতি ছিল তা পূরণ করার উদ্দেশে দুজন শ্রেষ্ঠ আলেম শাহ ইসমাঈর শহীদ ও মওলানা আবদুল হাইকে তাঁর একান্ত সহযোগী করে দেন। তাঁরা সাত বছরের একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত সফর করে হাজার হাজার সহযোগী নিয়ে কোলকাতা বন্দর থেকে জাহাজযোগে হজ সফরে বের হন। আরব দেশে কয়েক বছর অবস্থান করে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন এবং বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ শিষ্যদের নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। শাহ অলিউল্লাহর রাজনৈতিক প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাঁরা পারিবারিক রাজতন্ত্রের পথ পরিহার করে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নির্বাচিত নেতার মাধ্যমে ইসলামী নিযাম প্রতিষ্ঠার পথ অবলম্বন করেন। এজন্য তাঁর প্রতিপক্ষ জালেম ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। ১৮৩৭ সালে বালাকোটের যুদ্ধে হযরত সাইয়েদ আহমদ ও শাহ ইসমাঈল এবং তাঁদের সাথে আরো বিপুল সংখ্যক মুজাহিদের শাহদত বরণের ফলে এ জিহাদ আন্দোলন প্রথমবারের মতো আপাতত স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সমগ্র হিন্দুস্তানব্যাপী এর অসংখ্য প্রচারক, সংগঠক, প্রশিক্ষণদাতা উলামা সক্রিয় থাকেন এবং তৎকালীন হিন্দুস্তানের বিদেশী অমুসলিম শাসক ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে একটি অগ্নিগর্ভ পরিবেশ তৈরি করেন। এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় সিপাহী বিদ্রোহের কার্যক্রম।

তথ্যসূত্র ১। শাহ ইসমাঈল শহীদের আগমন শাহ অলিউল্লাহর প্রায় একশো বছর পরে হলেও শাহ অলিউল্লাহর শিক্ষা ও কর্মসূচির তিনি একজন সফল বাস্তবায়নকারী এবং এখানে শাহ অলিউল্লাহর বক্তব্যকে তিনি পূর্ণতা দিয়েছেন। ২। ফতোয়া আযীযী, ফারসী, প্রথম খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, মুজতবায়ী মাতবা কর্তৃক প্রকাশিত। উলামায়ে হিন্দু কা শানদার মাযী, ৩ খণ্ড, মওলানা সাইয়েদ মুহম্মদ মিয়া, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা। ৩। শাহ অলিউল্লাহ কি সিয়াসী তাহরীকঃ মওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী, পৃষ্ঠা ১১৮।

সূত্রঃ বদ্বীপ প্রকাশন প্রকাশিত "মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭" গ্রন্থ

দ্বিতীয় পর্বঃ ১৮৫৭-এর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

আবদুল মান্নান তালিব